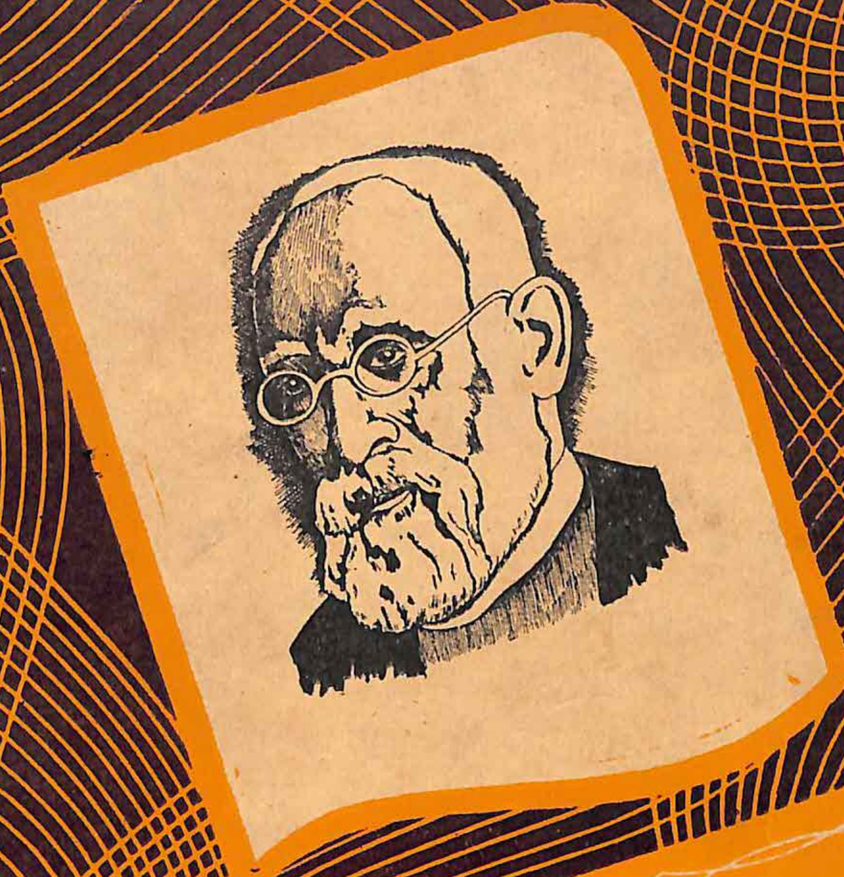


ছোটদের সুরেন্দ্রনাথ

বিচিত্র-জীবন গ্রন্থমালা



ছোটদের সুরেন্দ্রনাথ

সরলানন্দ সেন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-১২

॥ প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ঃ ১৩৬৪ ॥

॥ দাম ঃ এক টাকা চারি আনা ॥

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান কর্তৃক নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

॥ এক ॥

প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। এই বিশাল ভূখণ্ড ভারতবর্ষে তখন অখণ্ড জাতীয়তাবাদ বলিয়া কোনও কিছুর কল্পনাও কেহ করিতে পারিতেন না। এই বিরাট দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কত যুগ পূর্ব হইতে কত বিচিত্র সব মানুষ বাস করে! তাহাদের চেহারায়, ভাষায়, আচার-ব্যবহারে ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে হুবহু সাদৃশ্য কমই দেখা যায়। নৈসর্গিক দৃশ্য, বন-উপবন, নদী-গিরি, পশু-পক্ষী ও ফুল-ফলেরই বা কী বিচিত্র সমারোহ এই দেশে! আর এই দেশের খনিগর্ভেই বা কত রত্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে!

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও সুমহান্ ঐক্যের, শত বিভিন্নতার মধ্যেও দুর্ধর্ষ এক জাতীয়তাবোধের প্রেরণা যাঁহাকে সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বাঙালী, অসমীয়া, পাঞ্জাবী, বিহারী, রাজপুত ও মারাঠীর মধ্যে ভাষাগত বা সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সকলেরই এক ও অভিন্ন এবং এই চেতনা ভারতবাসীর মনে-প্রাণে দ্রুত সঞ্চার করিতে না পারিলে এই দেশের মাটি হইতে বৃটিশ শাসনের মূলোচ্ছেদ কখনও সম্ভব নহে।

সুরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভূমি চব্বিশ পরগণা জেলার মণিরামপুর গ্রামে। বারাকপুর সেনা-নিবাসের নিকটে মণিরামপুর অবস্থিত। সুরেন্দ্রনাথের পিতা-পিতামহরা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম হইলেও, সুরেন্দ্রনাথের পিতা ইংরেজী শিক্ষার পরম অনুরাগী ছিলেন। সেই কালে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগী ছিলেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন তাঁহারই একজন প্রিয় ছাত্র।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর (২৬শে কার্তিক, ১২৫৫ সাল) কলিকাতা তালতলা অঞ্চলে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পাঠশালায় ভর্তি হন। তাঁহার পাঠশালার গুরুমহাশয় খুব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তাঁহার শাসনে ছাত্ররা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। সুরেন্দ্রনাথকে একদিন এই গুরুমহাশয় "বামুনের মেড়া" বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহার ফলে তিনি পাঠশালা বর্জন করেন এবং তারপর আর একদিনও তিনি পাঠশালায় যান নাই। অতঃপর বাংলা স্কুলে ভর্তি হইয়া সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি ডভটন কলেজে ভর্তি হন।

এই কলেজে ইঙ্গ-ভারতীয় বিদ্যার্থীরাই ছিল সংখ্যায় অধিক। সুরেন্দ্রনাথ যখন এখানে ভর্তি হন, তখন তিনি মোটেই ইংরেজী জানিতেন না। তখন সবেমাত্র ইংরেজী বর্ণ-পরিচয় আরম্ভ! অথচ, যাহারা অনর্গল ইংরেজীতে কথা

বলিত, এখানে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইত। কাজেই ইংরেজী ব্যাকরণ শিখিবার পূর্বেই তিনি ইংরেজীতে কথা বলা শিখিতে বাধ্য হন। ফলে, তিনি অশুদ্ধ ইংরেজীই বলিতেন। কিন্তু ব্যাকরণে জ্ঞানের অভাব তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার পথে বাধা হইল না। তিনি শুনিয়া শুনিয়া ব্যাকরণের জ্ঞান অনেকখানি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

স্কুল বা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কখনও গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হন নাই। নিজের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন। এই আত্মনির্ভরশীলতা তাঁহার মনে গভীর আত্মবিশ্বাসের বীজ বপন করে। আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়াই তিনি ল্যাটিন ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। অবশ্য, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়-বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারিলেও তিনি তাহার কাছাকাছি হইতেন এবং এইজন্য প্রতি বৎসরই পারিতোষিক লাভ করিতেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের অন্যতম সদ্‌গুণ ছিল মনের দৃঢ়সঙ্কল্প।

ইহা ছাড়া, বাল্যকাল হইতেই তিনি কেমন করিয়া নিজের স্বাস্থ্য অটুট রাখা যায়, সেই বিষয়ে সতত যত্নশীল ছিলেন। শরীরকে কর্মপটু ও সবল রাখার জন্য তিনি প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা করিতেন। তাঁহাদেরই

বসতবাটীতে একটি ডনের আখড়া ছিল। তিনি এখানে এক পালোয়ানের নিকট কুস্তি শিখিতেন। কুস্তি শিক্ষাকালেও তিনি বিদ্যার্জনের সমান নিষ্ঠারই পরিচয় দিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের যৌবনকালে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন নেতার বক্তৃতা তাঁহার মন আকৃষ্ট করে। ইঁহাদের মধ্যে কেশব সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কেশব সেনের সুমধুর কণ্ঠ, কথা বলার মনোরম ভঙ্গি, সে যুগের তরুণ বাংলার কোমল চিত্তকে যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছিল। কেশব সেনের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে সুরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতেন। ইঙ্গ-ভারতীয়দের স্কুলে অধ্যয়ন করিলেও তিনি তাহাদের ছাত্রদের নিকট হইতে কখনও দুর্ব্যবহার পান নাই। এই দেশে অবস্থানকারী অনেক ইংরেজও তখন বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসার লাভ করুক, এইরূপ কামনা করিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন পরম বিদ্যোৎসাহী। সুরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করিলে তিনি তাঁহাকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য বিলাত পাঠাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে সুরেন্দ্রনাথ অপর দুই সাথী বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করিবেন এইরূপ স্থির হয়।

॥ দুই ॥

এই সময় ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কতকগুলি সংস্কার-আন্দোলনও মাথা তোলে। ফিরিঙ্গী সভ্যতার উন্মাদনা ও সংস্পর্শ এই দেশের যুব-মনকে সর্বপ্রথম চঞ্চল ও বিহ্বল করিয়া দেয় ; নিজের দেশের সভ্যতার প্রতি তাচ্ছিল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশ্য, এই দেশের সনাতন ধর্মানুশাসন-পীড়িত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার এই সময় বহু ক্ষেত্রে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে আমাদের দেশের অনেক সংস্কারকেই তখন নূতনভাবে নিরীক্ষণের আবশ্যকতাও ছিল প্রচুর। ব্রাহ্মসমাজের সুধী নেতৃবৃন্দ সেই দায়িত্বই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজকে এই সময় ইউরোপীয় সভ্যতার নির্বিচার অনুকরণের অভ্যাস হইতে রক্ষা করিতে এবং এই দেশের আচার-রীতি ও প্রথাসমূহকে যুগোপযোগী ও যথার্থ করিয়া তুলিতে অসাধারণ শ্রম ও অধ্যবসায় স্বীকার করেন।

ঠিক এমনই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যের পাশাপাশি মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়। সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ইংরেজী সভ্যতার প্রথম স্পর্শে এই

দেশের শিক্ষিত সমাজে তখন এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মদ্যপান না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মনীষীদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে, অবশেষে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন সফল হয়।

অপর ঐতিহাসিক আন্দোলন প্রবর্তন করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইহার নাম বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই আন্দোলনের বিস্তৃতি সাধনে সাহায্য করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব, অটুট সঙ্কল্প, দীন-দুঃখীর প্রতি অপার করুণাবোধ সুরেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত করে।

এক দিকে সনাতনধর্মীদের পীড়ন ও শাসনে অনগ্রসর হিন্দু সমাজ তখন একেবারে অসাড় ও আড়ষ্ট, অপর দিকে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্যুৎ-ঝলসানিতে দেশের শিক্ষিত সমাজের নয়ন আচ্ছন্ন। স্বাদেশিকতাবোধ, স্বদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনের চিন্তা তখন দেশবাসী অনেকেরই স্বপ্নেরও অগোচর! ঠিক এমনি সময়ে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপর দুই সাথী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন

বয়সে তিন জনই তরুণ। বুকে উচ্চশিক্ষা-লাভের আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সনাতনীদের হাতে দণ্ডলাভের আশঙ্কাও কম নয়।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে বিলাতে উচ্চশিক্ষা-লাভের সুযোগ দানে উৎসাহী ছিলেন, এ কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী জননী এই সংবাদ শুনিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহার নিকট এক পরম দুঃসংবাদ বলিয়া মনে হইল।

পুত্রকে বিদায়দানের সময় সুরেন্দ্রনাথের পিতার চোখে জল আসিয়া গেল। দুঃখের বিষয়, ইহাই সুরেন্দ্রনাথের শেষ পিতৃদর্শন। কারণ, তাঁহার বিলাতে অবস্থানকালেই পিতার মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে অসাধারণ ভক্তি করিতেন। পিতার চরিত্রের নিঃস্বার্থপরায়ণতা, উদারতা ও দুঃস্থের প্রতি সহানুভূতিপ্রবণতা তাঁহাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজিয়েট স্কুলের লাটিন ভাষার শিক্ষক টালফোর্ড ইলি সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। কঠোর শ্রম সহকারে অধ্যয়নের পর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু উত্তীর্ণ হইলে কি হইবে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে সেই সময়ে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, সেই অনুসারে সুরেন্দ্রনাথের বয়স উনিশের বেশী এবং একুশের কম হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ১৮৬৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের বয়স একুশের বেশী হয়। এই কারণে তাঁহাকে উত্তীর্ণদের মধ্যে একজন বলিয়া গণ্য করিতে কর্তৃপক্ষের আপত্তি হইল। সুরেন্দ্রনাথ আদালতের শরণাপন্ন

হইলেন। বিচারের ফলে তিনি জয়ী হন এবং ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁহার বয়স গণনা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাই সফল হয়। সেই সময়ে বাঙালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মহারাজ রমানাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুরেন্দ্রনাথকে এই ব্যাপারে সমর্থন করেন।

সুরেন্দ্রনাথের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ তাঁহার পিতা শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যথিত হন। ১৮৭০ সালে তাঁহার পিতা মারা যান।

লণ্ডনে অবস্থানকালে সুরেন্দ্রনাথ যে কয়জন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রিয় পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম অধ্যাপক গোল্ডস্টাকার ও হেনরি মর্লি। ইঁহারা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে স্বজনের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ডক্টর গোল্ডস্টাকার ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। তাঁহার হৃদয় ছিল বজ্রের মত কঠোর, আবার কুসুমের মত কোমল। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও ছিল অপরিসীম। কিন্তু অধ্যাপক মর্লির স্বভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সর্বদা উৎফুল্ল থাকিতেন এবং এক মুহূর্তও কাজ-ছাড়া থাকিতে পারিতেন না।

॥ তিন ॥

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইবে; সুরেন্দ্রনাথ দিন-রাত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এমন রাত্রিও গিয়াছে যে, তিনি ঘুমাইবার অবকাশ পান নাই। কখন যে রাত্রি প্রভাত হইল, তিনি তাহা হয়ত লক্ষ্যই করিতে পারেন নাই!

তাঁহার মনোবল ছিল দুর্জয়। কাজেই এইরূপ অমানুষিক শ্রম-স্বীকারের পরও তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই। অবশ্য, বাল্যকালে তিনি নিয়মিত ব্যায়ামাভ্যাস করিয়া শরীরকে সুগঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট থাকার ইহাও অন্যতম কারণ।

এই পরীক্ষায় প্রস্তুতির সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের চিন্তা ছিল গৌণ। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে, এই কঠোর সঙ্কল্প তাঁহার মনে একাগ্রতা বৃদ্ধি করে।

১৮৭১ সালে সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দেশে ফিরিবার পূর্বে তিনি ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন।

এই দেশ-ভ্রমণের সময় এক মজার ঘটনা ঘটে। সুরেন্দ্র-নাথ তাঁহার অপর দুই সঙ্গী, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া ইটালী ও প্যারী প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ

করেন। প্যারী হইতে তাঁহারা ভার্সাই যান। ভার্সাই হইতে প্যারী ফিরিবার সময় ভার্সাই রেলস্টেশনে পুলিশ তাঁহাদিগকে প্রুসিয়ার গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করে। ভারতীয় পোশাক-পরিহিত লোক দেখিয়াই বোধ হয় তাহাদের সন্দেহের উদ্রেক হয়। পুলিশ তাঁহাদিগকে থানায় লইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা থানার কর্মচারীদের সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলেন। কিন্তু তাহারা কেহই ইংরেজী বুঝিত না। তাহারা তাঁহাদিগকে থানার হাজতে তালাবন্ধ অবস্থায় রাত্রি দশটা হইতে সকাল নয়টা পর্যন্ত আটক করিয়া রাখে।

অবশেষে ইংরেজী ভাষা জানে এরূপ একজন অফিসার তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সমস্ত বিষয় অবগত হন। ভদ্রলোক তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া কতকটা অপ্রতিভ হন এবং যে লাঞ্ছনা তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে সুরেন্দ্রনাথ সবান্ধবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু সমাজ তাঁহাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিল না। সুরেন্দ্রনাথের পরিবার কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবার বলিয়া খ্যাত ছিল। পরিবারে তাঁহার অসমাদর না হইলেও, সমাজের সাধারণ লোক তাঁহার পরিবারের সহিত সম্পর্ক বর্জন করিয়া চলিল। কিন্তু কেশব সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তকে কলিকাতায় এক সভায় সম্বর্ধিত করেন।

অতঃপর নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীহট্ট জেলা তখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় বিভাগীয় পরীক্ষায় সুরেন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সহিত সাফল্য অর্জন করেন এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বেতন-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সাফল্য ও কর্তব্যানুরাগ তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ডের নিকট অসহ্য বোধ হইল। তিনি সর্বদা সুরেন্দ্রনাথের ত্রুটি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

এই ভদ্রলোক ছিলেন ইঙ্গ-ভারতীয়। বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথের উন্নতি তাঁহার মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিল। কিন্তু, অপর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এণ্ডারসন সাহেবের সহিত সুরেন্দ্রনাথের ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাব। উভয়ের মধ্যে এই মিত্রতা দেখিয়া সাদারল্যাণ্ড যেন আরও জ্বলিয়া উঠিলেন! যে কোন প্রকারে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে জব্দ করার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ কাহারও তোষামোদ করিতে পারিতেন না। কাজেই সাদারল্যাণ্ড তাঁহার মতন স্বাধীনচেতা লোকের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। সাদারল্যাণ্ড

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহারই অধীনে কাজ করিতে হয়। অতএব, সুরেন্দ্রনাথকে অপদস্থ করিতে তাঁহার বেগ পাইবার কথা নয়; হইলও তাহাই।

দেখা গেল, নৌকা-চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত এক আসামীকে সুরেন্দ্রনাথ ফেরারী ঘোষণা করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের পেশকার বহু দলিল-পত্রের সঙ্গে ঐ আদেশপত্রটিও তাঁহাকে দিয়া সই করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রত্যেকটি দলিলের ভিতর কি লেখা রহিয়াছে, তাহার খুঁটিনাটি দেখিয়া শুনিয়া তবে সই করা কোনও হাকিমের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষেও তাহা সম্ভব ছিল না। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এই ব্যাপারে তিনিও পেশকারের উপরই নির্ভর করিতেন এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই এই সই করিয়াছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যাণ্ডেরই যে ইহা কারসাজি, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি এই সম্পর্কীয় যাবতীয় নথিপত্র তলব করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সত্য ঘটনা বিবৃত করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেলা-জজের নিকট অভিযোগ করিলেন। একে সুরেন্দ্রনাথ 'কালো আদমি', তাহাতে আবার স্বাধীনচেতা। সুতরাং তাঁহার অপসারণই সাদার-ল্যাণ্ডের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব, জেলা-জজও ঘটনাটি হাইকোর্টের গোচরে আনিলেন।

অতঃপর এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তিনজন সদস্যযুক্ত

একটি কমিশন নিয়োগ করা হইল। কমিশনের সিদ্ধান্ত-অনুসারে সুরেন্দ্রনাথকে অপসারিত করা হইল। সুরেন্দ্রনাথ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করিতে আবেদন জানান; কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। তাঁহাকে বরখাস্ত করিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করা হইল। সুরেন্দ্রনাথের এই কর্মচ্যুতি ভারতের শিক্ষিত সমাজে বিলক্ষণ বিক্ষোভ সঞ্চার করিল।

সুরেন্দ্রনাথ চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইলেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইংরেজের ন্যায় বিচারে আস্থাবান ছিলেন বলিয়া এই বিষয়ে সুবিচার-প্রাপ্তির আশায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। কিন্তু সেখানে ন্যায় বিচার পাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহাকে সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, সিভিল সার্ভিস হইতে তিনি অপসারিত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ ইহাতেও হতাশ হইলেন না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, উচ্চ রাজকর্মচারীর পদ গিয়াছে, ক্ষতি নাই, তিনি ব্যারিস্টার হইবেন। আবশ্যকীয় অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি ইহাতেও বাধা সৃষ্টি করিল। সিভিল সার্ভিস হইতে তিনি অপসারিত হইয়াছেন, এই বিষয়টির প্রতি ঐ ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে, তাঁহাকে ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত হইতে দেওয়া হইল না।

সুরেন্দ্রনাথ এক্ষণে বুঝিলেন, তিনি পরাধীন ভারতবাসী বলিয়াই এইভাবে পদে পদে তাঁহাকে বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইতেছে। দাসত্বের গ্লানিতে তাঁহার মন দগ্ধ হইল। তিনি তখন জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

১৮৭৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৮৭৫ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি বিলাতে অবস্থান করেন এবং সকাল দশ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা আট ঘটিকা পর্যন্ত তিনি অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে তিনি আত্মগঠনে মনোযোগী হন। এই তপশ্চর্যা তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সন্ধান দিল। স্বদেশ-সেবার প্রেরণা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

এক বৎসর বিলাতে অবস্থান করিয়া তিনি ১৮৭৫ সালে দেশে ফিরিয়া আসেন। সরকারী চাকুরি হইতে অপসারিত হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের অন্যান্য হিতৈষিবর্গ তাঁহার সম্পর্কে হতাশ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী ইহাতে এতটুকুও মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই।

দেশে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ সমাজের হিতকর বিবিধ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে দুইশত টাকা বেতনে মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত করিলেন। সরকারী চাকুরিতে তিনি ইহার দ্বিগুণেরও বেশী টাকা পাইতেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের মনে ইহাতে কোন ক্ষোভ

হইল না। অধ্যাপনার কাজকে তিনি পবিত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া উহার মাধ্যমে তরুণ ছাত্রদের মনে দেশানুরাগ-সঞ্চারে ব্রতী হইলেন।

স্বল্পকাল মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র-সমাজে সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ছাত্রদের সঙ্ঘ-সমিতি-গঠনে তিনি পরম সহায় হইলেন।

এই সময়ে (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) সিটি কলেজ স্থাপিত হইল। তিনি সিটি কলেজে যোগদানের আমন্ত্রণ পাইলেন এবং তাহা গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার মাসিক বেতন ছিল তিনশত টাকা মাত্র।

এমন সময় ত্রিপুরা মহারাজের নিকট হইতে মাসিক সাত শত টাকা বেতনে তাঁহার সেক্রেটারি-পদের আমন্ত্রণ আসে। তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই প্রত্যাখ্যানের মূলে ছিল দেশাত্মবোধের প্রেরণা।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি নূতন শিক্ষায়তনের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। উহার নাম প্রেসিডেন্সি ইনস্টিটিউশান। পরে ইহাই 'রিপন কলেজ' নামে খ্যাত হয়। অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ' রাখা হইয়াছে।

রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের ফলে সুরেন্দ্রনাথকে অচিরে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

কাজেই তাঁহাকে অধ্যাপনা-ব্রত ত্যাগ করিতে হইল। অনেকটা অনিচ্ছায়ই তিনি শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "শিক্ষাকার্যের ন্যায় রাজনৈতিক কার্যেরও আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু শিক্ষার তুলনায় রাজনৈতিক কার্য স্বল্পস্থায়ী। শিক্ষাদান মহান্ ও পবিত্র বৃত্তি।"

কোন কাজে ফাঁকি দেওয়া ছিল সুরেন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কাজেই কলেজে অধ্যাপনাকালেও তাঁহাকে কঠোর শ্রম ও যত্ন স্বীকার করিতে হইয়াছে। কারণ, নিজেও না পড়িয়া কিংবা ভালরূপে প্রস্তুত না হইয়া তিনি কখনও কলেজে যাইতেন না।

॥ চার ॥

ইটালীর রাজনৈতিক নেতা ম্যাটসিনির জীবনের দেশানুরাগ সুরেন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতার সময় তরুণ সমাজের মধ্যে ম্যাটসিনির দেশপ্রেমের কথা প্রচার করিতেন। কিন্তু ম্যাটসিনির বিপ্লববাদ বাংলায় রূপায়িত হউক, তাহা তিনি চাহিতেন না। ম্যাটসিনির আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হইয়া

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বীয় জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনে এই দেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধ হউক, ইহাই ছিল তাঁহার কাম্য।

১৮৭৬ সালে প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান বা ভারত-সভা স্থাপিত হয়। আনন্দমোহন বসু ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি-বৃদ্ধির কার্যে উদ্যোগী হন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভায় সুরেন্দ্রনাথ শোকাভিভূত হৃদয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। কারণ, এইদিন প্রাতে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়। তথাপি পুত্র-শোকে তিনি বিহ্বল না হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই গভীর আত্মসংযমের জন্য অনেকে তাঁহার এই বিপদের খবর সেই দিন জানিতেও পারেন নাই!

এই সময়ে (১৮৭৭ সালে) ভারত-সচিব মার্কুস অব্ স্যালিসবারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ বৎসর নির্দিষ্ট করেন। ভারতীয়গণ যাহাতে অতি অল্প সংখ্যায় এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, ইহাই ছিল এই নির্দেশের উদ্দেশ্য। ভারত-সভা ইহার প্রতিবাদে সমগ্র দেশে এক আন্দোলন আরম্ভ করিবে স্থির করে। এই উপলক্ষে কলিকাতায় এক মহতী জনসভা হয়। বিভিন্ন রাজ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইল সুরেন্দ্রনাথের উপর।

পুরস্কার হিসাবে ভারতীয়দের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম কারাদণ্ড। ব্যাপারটি ছিল এইরূপ ঃ

সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বেঙ্গলী'তে ১৮৮৩ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে নিম্নরূপ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং ইহা দ্বারা হাইকোর্টের প্রতি অবমাননা করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় ঃ "হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এতকাল সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অবশ্য, কখনও কখনও তাঁহারা ভুলও করিতে পারেন, তবে তাহা জ্ঞান বা সৌজন্যের অভাব হেতু ঘটে নাই। এখন এমন এক ব্যক্তি হাইকোর্টের বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যিনি জেফ্রিস এবং স্ক্রগের সমতুল্য না হইলেও দেশের সর্বোচ্চ বিচারাসনে বসিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কখনও কখনও আমরা বিচারপতি নরিশের বিচার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছি। কিন্তু এইবার চরম পরিণতি ঘটিয়াছে এবং আমরা আমাদের সহযোগী 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনাটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "বিচারপতি নরিশের শেষ জবরদস্তিমূলক কাজ হইতেছে, একটি শালগ্রাম শিলা কোর্টে আনাইয়া পরীক্ষা করা। সাবেক সুপ্রিম কোর্টে ও বর্তমান হাইকোর্টে হিন্দু দেব-দেবী সংক্রান্ত বহু মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে;

কিন্তু ইতঃপূর্বে কখনও কোনও হিন্দু দেব-দেবী আদালত-কক্ষে টানিয়া আনা হয় নাই। ডেনিয়াল-সদৃশ কলিকাতার এই বিচারক মহোদয় শালগ্রাম শিলাটির প্রতি তাকাইয়া বলেন যে, ইহা একশত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে না। অতএব, দেখা যাইতেছে, বিচারপতি নরিশ কেবল আইনেই অভিজ্ঞ নহেন, পরন্তু, তিনি হিন্দুর দেবতা-বিগ্রহ সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। বাস্তবিক তিনি যে কি নহেন, তাহাই বলা শক্ত। কলিকাতার সনাতন হিন্দুরা তাঁহাদের গৃহ-দেবতাকে কোর্টে আনানোর অবমাননা সহ্য করিবেন কিনা, তাহা তাঁহাদেরই বিচার্য বিষয়; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাধারণের পক্ষ হইতে এইরূপ খামখেয়ালি বন্ধের চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।"

এখানে বলা আবশ্যক যে, যে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নে' উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়, উহার সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত এটর্ণী ভুবনমোহন দাশ।

হাইকোর্টের একটি ফুল বেঞ্চে সুরেন্দ্রনাথের বিচার হয়। তাঁহার বিচারের দিন বহু ছাত্র হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিচারের রায় ঘোষিত হইলে দেখা যায়, রাস্তায় হাজার হাজার লোক বিক্ষোভ-প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছে। শুধু কলিকাতায় নহে, ভারতের সর্বত্র এই দণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভসৃষ্টি হয়। এই দিন কলিকাতা শহরে ভারতীয়দের যত দোকান ছিল, সবই বন্ধ রাখা হয়।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়া গিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ছাড়া আর কখনও তিনি বাংলার সর্বত্র এমন আবেগ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করেন নাই।

।। ছয় ।।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ মনে করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় লাহোর, অমৃতসহর, মুলতান, রাওয়ালপিণ্ডি, আম্বালা, আগ্রা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ ও কাশী সফর করেন।

তখনও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-সম্পর্কীয় বয়সের সীমা পরিবর্তন করা হয় নাই। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের পরও উহা অপরিবর্তিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার উত্তর-ভারতে সফরকালে যে সব সভায় বক্তৃতা দেন, সেই সব সভায় সরকারের এই নীতির প্রতিবাদ করেন। শীঘ্রই ইহার সুফল ফলে। এই আন্দোলনের ফলে, ভারত-সরকারের টনক নড়ে। ভারত-সরকার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সের সীমা বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারত-সচিবকে পত্র দেন। পরবর্তী বৎসরই একটি পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয় এবং উহার সুপারিশ অনুসারে বয়সের সীমা নূতনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান নূতন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনকে কলিকাতায় তাঁহার প্রথম আগমন উপলক্ষে একখানি মানপত্র দেয়। এই মানপত্রের রচয়িতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। মানপত্রে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়। ব্যবস্থাপক সভা বা আইনসভাগুলির ব্যাপকতা বৃদ্ধির চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ ইহার পূর্বেই আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৮৭ সালে মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক উৎসবে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথকে সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানান। বলা আবশ্যক যে, সেই সময় পৌরসভার পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল শাসক-গোষ্ঠীর হাতে। সুরেন্দ্রনাথ সেই সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি মফঃস্বলের পৌরসভাগুলি হইতে বড়লাটকে মানপত্র-দানের ব্যবস্থা করেন এবং সেই মানপত্রে এই দেশের আইনসভা নির্বাচন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন জানান হয়।

এই সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আইনসভাগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। পাঁচ বৎসর পর এই আবেদনের ফল পাওয়া গেল। লর্ড ডাফরিনের সহিত সুরেন্দ্রনাথের ইতঃপূর্বে বিলাতেও পরিচয় ছিল। আইনসভা-সংস্কার-বিষয়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ চাহেন। নির্বাচনের

ভিত্তিতে আইনসভা-প্রতিষ্ঠা এবং সদস্যদিগকে প্রশ্ন করিবার অধিকার-প্রদান, সুরেন্দ্রনাথ এই দুইটি বিষয়ের মঞ্জুরি প্রার্থনা করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয়।

এইরূপ প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশের বিবিধ সামাজিক সমস্যা ও উহার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা হইত। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ এই সব বিষয়ে আলোচনা করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না, তাঁহারা প্রত্যেকটি সমস্যার কার্যতঃ সমাধানের প্রচেষ্টায়ও অগ্রসর হইতেন। এই সময়ে সমাজে মদ্যপান একটি ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া ছিল, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ-প্রবর্তন ও শিশুবিবাহ-নিবারণসমস্যা। এই বিষয়ে ১৯১৪ সালে কুমিল্লায় এক সামাজিক সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলনে তিন সহস্রাধিক নর-নারী সমবেত হন। তন্মধ্যে মাত্র বারো জন বিধবা মহিলা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় একবার এক ব্রাহ্মণ বিধবা-বিবাহের বিজ্ঞাপন দিলে অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়। এই দেশে পত্রিকায় বিধবা-বিবাহের

বিজ্ঞাপন বোধ হয় ইহাই প্রথম। সুরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে যে সব চিঠি পান, তাঁহার কয়েকজন সনাতনপন্থী বন্ধুকে তিনি তাহা দেখান। সনাতনপন্থীরা এইসব চিঠি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, ভাটপাড়া, বজ্রযোগিনী আর নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা যত বিরোধিতাই করুন না কেন, যত শাস্ত্রের দোহাই দিন না কেন, নূতন যুগের ভাবধারার নিকট তাহা স্রোতের তৃণের মতন ভাসিয়া যাইবে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। মাদ্রাজে হইল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। মাদ্রাজ অধিবেশনে লর্ড লিটনের আমলে প্রবর্তিত অস্ত্র-আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে অস্ত্র-আইন রদের দাবী জানান হয়। এই অধিবেশনে তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় গোহত্যা-রোধের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপনে উদ্যোগী হন। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিষ্ঠান। হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য হেতু কংগ্রেসকে হিন্দু কংগ্রেস আখ্যা দিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংস্রব বর্জন করিয়া চলিয়াছিল। গোহত্যা-নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইলে কংগ্রেসকে বিরুদ্ধবাদীরা সহজেই হিন্দু কংগ্রেস বলিয়া আখ্যা দিতে পারিবে। কংগ্রেস-নায়কগণ তাই ইহাতে আপত্তি করিলেন। তখন সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন যে, কোনও

বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়-সম্পর্কিত প্রস্তাব, সংশ্লিষ্ট শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কর্তৃক অসমর্থিত হইলে জাতীয় কংগ্রেসে তাহা উত্থাপিত হইবে না।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে জাতীয় আন্দোলন-পরিচালনার জন্য অর্থের আবেদন জানান হয়। সেই বিশাল জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইলে এক ঘণ্টার মধ্যে জনতার নিকটে চৌষট্টি হাজার টাকার অঙ্গীকার পাওয়া যায়। সভাস্থলেই বিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। সভায় অনেকে ঘড়ি ও অলঙ্কারাদি পর্যন্ত খুলিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত।

॥ সাত ॥

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে সুরেন্দ্রনাথ, এলেন হিউম, স্যার ফিরোজশা মেহতা, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরফ্‌উদ্দিন, নর্টন এবং আর্. এন. মুধোলকার বিলাত গমন করেন। বিলাতে ভারতের পক্ষে প্রচারকার্য পরিচালনা এবং পার্লামেণ্টে ভারতের পক্ষে আইনসভাগুলির সংস্কারপ্রস্তাব-উত্থাপনের পক্ষে আন্দোলন-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়।

এই প্রতিনিধিদলের আন্দোলনের ফলে আইনসভা-সম্পর্কিত নূতন নির্বাচনপ্রথা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেও, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের আইন অনুসারে মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডগুলি নিজ নিজ আইনসভায় সদস্য প্রেরণের অধিকার পায়। প্রাদেশিক আইনসভায় বে-সরকারী সদস্যগণও কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য-প্রেরণের অধিকার পান। অবশ্য জেলা-বোর্ডগুলি সরকারের অনুমোদন পাইলেই প্রাদেশিক আইনসভায় উহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিত।

সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতির সমবেত চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলেই পার্লামেন্টে এইরূপ আইন পাশ সম্ভব হয়।

অক্সফোর্ড ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত এক বিতর্ক-সভায় সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তাঁহার গভীর স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা অনেক ইংরেজের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি বলেন, "বিতর্ক-সভায় বলা হইয়াছে যে, ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ভারতবাসীরা বর্বর ও অসভ্য ছিল। এই সভায় উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আমি হিন্দু বলিয়া গৌরব বোধ করি; কারণ, এই জাতি এক মহৎ ও প্রাচীন বংশোদ্ভূত। ইউরোপের সুসভ্য জাতিগুলির পূর্বপুরুষেরা যখন বনে জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন, তখন

আমাদের পিতামহগণ বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা, মনোরম নগরী স্থাপন, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রচার এবং সমৃদ্ধি-শালিনী ভাষা অনুশীলন করিয়া যে খ্যাতি অর্জন করেন, আজও তাহা সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। (আনন্দধ্বনি)

"আপনারা রাস্তার অপর পার্শ্বে অবস্থিত বোড়লিয়ান লাইব্রেরিতেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচায়ক বহু গ্রন্থ পাইবেন। এই কারণেই ভারতবর্ষের লোক (ইংরেজদের তথায় গমনের পূর্বে) অসভ্য ও বর্বর ছিল, এই উক্তি সমর্থনের যোগ্য নয়। আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক যে রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি দাবী করিতেছি, তাহা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যেই যদি ঐরূপ মন্তব্য করা হইয়া থাকে, তবে উহার যুক্তিহীনতাও এই বলিয়া প্রতিপন্ন করিব যে, স্বায়ত্তশাসনমূলক রাষ্ট্রবিধি আর্য-সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল এবং আমরা সেই আর্য-বংশোদ্ভূত।"

॥ আট ॥

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টে গৃহীত আইন দ্বারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলির নব-বিন্যাস সাধন হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে কলিকাতার পৌরসভার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য-পদের জন্য নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ

হন। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনে, আরও দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রী বা সৌজন্যবোধের অভাব দেখা যায় নাই।

আইনসভার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ জয়ী হইলেন। পৌর-সভার প্রতিনিধিরূপে নূতন নিয়মে পুনর্গঠিত আইনসভায় তিনিই প্রথম সদস্য। সুরেন্দ্রনাথের এই সাফল্য তাঁহাকে কলিকাতার অধিবাসীদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিল। জনসেবায় তিনি আনন্দ পাইতেন। তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও ঐকান্তিক দেশ-সেবার পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গীয় আইনসভায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন-রূপে দীর্ঘ আট বৎসরকাল সদস্য-পদে বহাল থাকেন। তাঁহারই চেষ্টায় সেই সময়ে আইনসভায় বঙ্গীয় মিউনিসি-প্যাল আইনের সংশোধন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের বিপুল পরিবর্তন হয়। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা পৌরসভার কার্যে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই সহজে ইহা সম্ভব হয়।

কিন্তু বিভিন্ন শহরের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে উহাদের চেয়ারম্যান-নির্বাচনের যে অধিকার আইনে প্রদত্ত হয়, এখন সরকার তাহা ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহার বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও জনসভা-মারফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। স্যার চার্লস ইলিয়ট, স্যার আলেকজাণ্ডার

ম্যাকেঞ্জি, লর্ড কার্জন প্রভৃতি শাসকগণ নানাভাবে মিউনিসিপ্যালিটির স্বায়ত্তশাসনাধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া কলিকাতা পৌরসভাকে পূরোপূরি নিজেদের হাতের মধ্যে লইয়া যান। ইঁহাদের কার্যের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ এবং আরও সাতাশ জন সদস্য পৌরসভার সদস্যপদে ইস্তফা দেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না।

অতঃপর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস-সম্বন্ধীয় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বিলাতে ও ভারতে একই সঙ্গে গ্রহণের অনুরোধ জানান হয়। দাদাভাই নৌরজী এই সময়ে বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। প্রস্তাবটি তিনিও সমর্থন করেন।

উচ্চ রাজকার্যে ভারতীয়দের নিয়োগ এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন, এই দুইটি বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসকে আগ্রহশীল করিতে উদ্যোগী হন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। পুণায় কংগ্রেসের এই অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই সময় মহাদেও গোবিন্দ রানাডের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হন। রানাডের অলোকসামান্য মেধা, অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও চরিত্রের অমায়িকতা সুরেন্দ্র-

নাথকে মুগ্ধ করে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির ভাষণ-রচনায় কঠোর শ্রম স্বীকার করেন। তাই এই অভিভাষণ সকলের দ্বারা প্রশংসিত হয়।

॥ নয় ॥

সুরেন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসরের অধিককাল সংবাদপত্র-সেবায় রত ছিলেন। তিনি 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক দ্বারা তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করেন। পরে ইহা দৈনিক সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। কংগ্রেসের আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের দিকে দিকে জাতীয়তাবোধের বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। আর সেই সঙ্গে দৈনিক সংবাদপত্রের অভাবও অনুভূত হয়। কারণ, দৈনিক সংবাদপত্র ব্যতীত প্রচারকার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না।

'হিতবাদী' (বাংলা সাপ্তাহিক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ সেনের সহিত দশ বৎসরের মেয়াদে এক ব্যবসায়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকাকে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'বেঙ্গলী'ই সর্বপ্রথম 'রয়টার'-এর গ্রাহক হয়।

সুরেন্দ্রনাথের সাংবাদিক জীবনে তিনি কুৎসা-রটনা, রাজদ্রোহ অথবা ব্যক্তিগত নিন্দা-প্রচারের বিরোধী ছিলেন। অবশ্য এতৎসত্ত্বেও তিনি রাজদ্বারের লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি

পান নাই। রাজদ্রোহ না হয়, এই চেতনায় তিনি সতর্ক থাকিয়া লেখনী চালনা করিলেও, জাতির এক একটা সঙ্কট-কালে উত্তেজনাপ্রদ রচনা তাঁহার লেখনী-মুখে নিঃসৃত হইতই। এই সম্পর্কে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের যুগে সারা বাংলার জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সুরেন্দ্রনাথের লেখনীও স্বভাবতই অগ্নি উদ্গার করে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি মন্তব্যের জন্য দ্বিতীয় বার আদালত-অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হন। তখন মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মামলা বিচারাধীন ছিল। সেই সময় মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট এই মোকদ্দমায় যে এজাহার দেন, 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সেই সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। অবশ্য, মন্তব্যগুলির জন্য সুরেন্দ্রনাথ দায়ী ছিলেন। সহ-সম্পাদক কালীনাথ রায় ইহার জন্য দায়ী ছিলেন না। সম্পাদক হিসাবেও সুরেন্দ্রনাথের উপরই দায়িত্ব বর্তায়। তাই, আদালতে জবাব দেওয়ার সময় সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্যগুলির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন; কিন্তু কালীনাথ বাবুর ইহাতে আপত্তি ছিল। পরে অবশ্য, আইনগত কারণে মামলাটি বাতিল হইয়া যায়।

দৈনিক 'বেঙ্গলী'র দশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার পর

সুরেন্দ্রনাথ ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইলেন। ইহাতে আর্থিক অসুবিধা দেখিয়া তিনি কাশিমবাজার-মহারাজের সহিত অপর একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।

দৈনিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব স্মরণীয়। শাসক-গোষ্ঠী 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় মন্তব্যকে সেই যুগে সমীহ করিয়া চলিত। সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিতে মডারেট বা 'নরমপন্থী' ছিলেন বটে, কিন্তু, তাঁহার জনপ্রিয়তা এবং জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠীর দৃষ্টি অনিবার্যরূপে পতিত হয়।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন শিক্ষাসম্বন্ধীয় এক বৈঠক আহ্বান করেন। ইহা ছিল এক গোপন বৈঠক। বৈঠকে বড়লাট বাহাদুর ঘোষণা করেন যে, এই দেশের শাসন-কার্য পরিচালনায় তাঁহারা গোপনীয়তার প্রশ্রয় দিতে চাহেন না। তাই, শিক্ষার ক্ষেত্রেও গোপনীয়তা পরিহার করিয়াই তিনি চলিতে চাহেন। অথচ শিক্ষা সম্বন্ধীয় বৈঠকটি মোটেই প্রকাশ্য ছিল না। বাক্যে ও কার্যে এই অসামঞ্জস্য, এই কপটাচরণ সুরেন্দ্রনাথের মনকে কার্জনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলে।

লর্ড কার্জনের এই বৈঠকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু কমিশনে কোনও হিন্দু সদস্য গ্রহণ করা

হয় নাই। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সুরেন্দ্রনাথ ইহার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। জনসাধারণ সুরেন্দ্রনাথকে সমর্থন করে। সুরেন্দ্রনাথের সমালোচনা বৃথা যায় নাই। অচিরে এই কমিশনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য-রূপে লওয়া হয়।

কমিশনের রিপোর্ট অল্পকালের মধ্যেই বাহির হয়। কিন্তু রিপোর্ট প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে জনমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। কমিশনের রিপোর্টে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত কলেজ তুলিয়া দেওয়া এবং আইন-ক্লাশগুলির উচ্ছেদের জন্য সুপারিশ করা হয়। কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দেশের উচ্চ শিক্ষার মূলে কুঠার হানা। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং উহার কাছে সরকারকে নতি স্বীকার করিতে হয়।

॥ দশ ॥

শুধু সাংবাদিকতায় নয়, শুধু রাজনীতিতে নয়, সুরেন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেশ ও সমাজের উন্নতির জন্য কঠোর শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উচ্চ পদ ও উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরি হারাইয়াও তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন নাই। স্বল্প বেতনের শিক্ষাব্রতীর কাজ তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। শিক্ষা বিস্তারের মহৎ ব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি এই সময় নিজ অর্থ ও

শ্রমে রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হইলে তিনি রিপণ কলেজের স্বত্বাধিকার ত্যাগ করেন। কলেজ ও স্কুলের সমস্ত অধিকার ও দায়িত্ব-ভার তিনি একটি ট্রাষ্টির হাতে অর্পণ করেন।

ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে স্কুল ও কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অর্থ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। সংগৃহীত অর্থ দ্বারা জমি খরিদ করিয়া কলেজের একটি নিজস্ব বাড়ী নির্মাণের জন্য তিনি উদ্যোগী হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল না। অর্থ সংগৃহীত হইল, কলেজের জন্য জমি ক্রয় করা হইল এবং বাড়ীও নির্মিত হইল। তদানীন্তন বাংলার লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার এই কার্যে তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন।

অধ্যাপনার কাজে দীর্ঘ আটত্রিশ বৎসরকাল রত থাকার পরে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি ভারত-সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিয়া একই সঙ্গে আইন-সভার সদস্যের কাজ পরিচালনা কঠিন হইয়া পড়িল; কিন্তু এতদিনের ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ত্যাগ করিতে তিনি অন্তরে ব্যথা অনুভব করিলেন।

শিক্ষাচার্যের কাজ পরিত্যাগ করিলেও, তিনি কলেজের সহিত সংস্রব বর্জন করেন নাই। কলেজের পরিচালক-সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন।

ইহা ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য-রূপেও তিনি পাঁচ বৎসরকাল কাজ করিয়াছিলেন।

॥ এগারো ॥

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে তিনটি আদর্শ ছিল : (১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ সঞ্চার ; (২) হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ; (৩) প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে গণসংযোগ স্থাপন। ভারতের নানা ভাষা-ভাষী প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ-সৃষ্টি ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মৈত্রী-বোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। প্রদেশে প্রদেশে তিনি পরাধীন ভারতের সর্বত্র যে একই জ্বালা, সকলের মনেই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলেন। ভারতীয় একতা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা জনগণকে মুগ্ধ করে।

সুরেন্দ্রনাথকে প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই স্বদেশীপ্রচার করিতে যাইয়া অনেক সময় অনেক কৃচ্ছ্রতা বরণ করিয়া লইতে হইত। কখনও কখনও হয়ত এমন জায়গায় গিয়া পড়িতেন যে, সেখানে খাদ্যসামগ্রী অপ্রতুল।

এমন অবস্থায় তিনি অখাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্থির হয় যে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা, পূর্ববঙ্গের এই তিনটি জেলা চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু জনমত তখন জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই দেশের সর্বত্র ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইল। সরকার তাহাদের দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত হইল। ইহার পরে আবারও চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করার অভিলাষ বৃটিশ কর্তাদের মনে জাগে। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান এক কণ্ঠে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে সরকার তাহাতে নিরস্ত হয়। বাংলাদেশকে আকারে খর্ব করার পশ্চাতে বিদেশী সরকারের কয়েকটি হীন উদ্দেশ্য ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শাসক-গোষ্ঠীর নীতিই হইল বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরান। সারা ভারতে তখন যে নব জাতীয়তার জন্ম অনিবার্য ও অপ্রতি-রোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহার মূলে ছিল বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও বাঙ্গালীর অপরাজেয় মেধা। বাঙ্গালীর এই নেতৃত্বকে পঙ্গু করা বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। উপরন্তু, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান একতা দেখিয়াও সাম্রাজ্যবাদীদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার হয়।

এইজন্য তাহারা পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সহিত জুড়িয়া দিয়া একটি মুসলমান-প্রধান অঞ্চল সৃষ্টির মতলবে ছিল।

এইরূপ দেশ-বিভাগের বিরোধিতা করিবার জন্য সুরেন্দ্র-নাথও তাঁহার সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে বঙ্গ-বিভাগের তীব্র নিন্দা করা হয়। বঙ্গ-বিভাগ যদি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একান্তই আবশ্যক এবং অনিবার্য হয়, তবে বঙ্গ-ভাষাভাষী সমস্ত এলাকা একই শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হউক, এই মর্মে সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবের মর্ম মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়লাট বাহাদুরের হাতে পৌঁছাইবেন, স্থির হয়। ইহার পরও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান হলে, মহারাজার প্রাসাদে এবং কখনও বা ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের বাড়ীতে প্রায়শঃ অনুরূপ সভা হইত। এই উপলক্ষে সবচেয়ে বড় সভা হয় ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার টাউন হলে।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমগ্র দেশে এক প্রবল বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবও জাগ্রত করে। এই সময় বৃটিশ-দ্রব্য বয়কটের জন্য প্রচারকার্য আরম্ভ হয়। বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন ভারতে ইহাই প্রথম। জনসাধারণ এই

আন্দোলনকে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে। বালক, বৃদ্ধ, ধনি-দরিদ্র, বিদেশী বর্জন আন্দোলন দ্বারা প্রত্যেকেই প্রভাবান্বিত হন। বিদেশজাত দ্রব্যের উপর লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগ্রৎ হয়।

বাংলাদেশে এইভাবে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের আশ্রয়ে দিগ্‌দিগন্তে নূতন রাজনৈতিক চেতনা বিস্তৃত হয়। ইহার ফলে, এই সময়ে বিবাহ-বাসরে বিদেশী উপঢৌকন গৃহীত হইত না, উৎসবের বাড়ীতে বিলাতী চিনি ও বিলাতী লবণ ব্যবহৃত হইতে দেখিলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উৎসব বর্জন করিতেন। পূজা-পার্বণেও বিদেশী দ্রব্য বর্জনীয় ছিল।

বাংলাদেশের ছাত্রসমাজও নীরবে বসিয়া ছিল না। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাহারা 'বিদেশী পণ্যে করি পদাঘাত' ধ্বনি দিয়া মিছিল বাহির করিত। তারপর দলবদ্ধ হইয়া বিদেশী পণ্যের ঘাঁটি বড়বাজারে যাইয়া খরিদ্দারদিগকে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ ও বিলাতী পণ্য বর্জনের জন্য আবেদন জানাইত। কাহারও উপর জোর-জবরদস্তি করা তাহাদের নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। তথাপি পুলিশ তাহা-দিগকে শান্তিতে থাকিতে দেয় নাই। ছাত্রদের অনেককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিত। নেতারা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনিতেন।

ছেলেদের মনে দেশানুরাগ, স্বজাতি-বাৎসল্য ও শৃঙ্খলা-

বোধ সঞ্চার করা, জাতির কল্যাণে তাহাদের চরিত্র গঠন করা, নেতাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

॥ বারো ॥

বঙ্গবিভাগ-আন্দোলন জন্ম দিল স্বদেশী আন্দোলনের এবং স্বদেশী আন্দোলনের ফলে লোকের মনে জাগিল তীব্র দেশানুরাগ। দেশানুরাগ মানুষকে বিলাতী পণ্য বর্জনের মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। দেশের মানুষ দেশের শিল্পের দিকে তাকাইল। স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টায় একদল মানুষ তখন আত্মনিয়োগ করিলেন।

এমন দিনে হুগলী জেলার হরিপালে একদিন সভা করিতে গেলে গ্রামের তাঁতীরা দলে দলে আসিয়া স্বদেশী নেতাদিগকে সাধুবাদ জানাইয়া গেল। কারণ, এই সময় ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে দেশ ভরিয়া গিয়াছিল এবং এইভাবে ইংরেজরা এই দেশের তাঁতীদের জীবিকার উপর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ইংরেজরা এই দেশকে বাজাররূপে ব্যবহার করিতেছিল। শিল্পে অনগ্রসর এই বিপুল দেশ তখন লোভী ইংরেজের নিকট এক কামধেনু-স্বরূপ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের মিলে প্রস্তুত কাপড় এই দেশে বিক্রয় করিয়া ইংরেজ বণিকের দল অনায়াসে কোটি কোটি টাকা লুটিয়া

নিত। স্বদেশী শিল্পের প্রতি এই দেশের লোকের প্রীতি-বোধ জাগ্রত হইলে ইংরেজ বণিকদের এই মুনাফা লুণ্ঠন বন্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। তাই স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজকর্মচারীরা খড়্গহস্ত হইলেন।

কিন্তু তাহাতেও বাঙ্গালীর মন হইতে দেশপ্রেম নিভাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। শাসকদের নির্যাতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনে দেশানুরাগের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। বাংলাদেশের কাপড় অল্প হইলেও যাহাতে এই দেশের শ্রমেই উৎপাদিত হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ শ্রীরামপুরের একটি পুরাতন কাপড়ের কল হাতে নিলেন। এই কলটি বৃহদায়তন করিয়া সুচারুরূপে কার্য আরম্ভের জন্য তাঁহাদের আঠার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। টাকা সংগ্রহের জন্য আবেদন-পত্র প্রচারিত হইল। দেশবাসীর নিকট হইতেও অপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। বাংলাদেশের গৃহলক্ষ্মীরা ইহার জন্য বহু টাকা দিয়াছিলেন; সুতরাং ইহার নাম রাখা হইল 'বঙ্গলক্ষ্মী মিল'।

সুরেন্দ্রনাথ একদিন এক জনসভায় বক্তৃতাদান-প্রসঙ্গে ভারতীয়দের দ্বারা জীবনবীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করেন। দেশবাসী তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিল। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এবং আরও দুই একটি জীবনবীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইল।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশকে ভাগ করা হইবে বলিয়া স্থির ছিল। এই দিন বাংলাদেশের সর্বত্র রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়। বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদে এই দিন কলিকাতা শহরে এক বিরাট মিছিল বাহির হয়। মিছিলে যোগদানকারী তরুণরা প্রত্যেকে কাল জামা এবং বাসন্তী রঙের পাগড়ী পরিয়া আসেন। বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর, বারাসত, বজবজ প্রভৃতি স্থান হইতে পতাকা হস্তে হাজার হাজার যুবক মিছিল করিয়া কলিকাতায় সমবেত হয় এবং কলেজ স্কোয়ার হইতে টাউন হল পর্যন্ত বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়।

সুরেন্দ্রনাথ টাউন হলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিশাল জনসমুদ্র চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "উপরতলায়, নীচতলায় ও মাঠে তিন জায়গায় সভা হওয়া উচিত।"

সেই যুগে আজিকার দিনের মতন মাইকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। তাই, নেতাদিগকে নিজ নিজ কঠোর চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে হইত। সুরেন্দ্রনাথের কথানুযায়ী তিন জায়গায় সভা হইল।

উপরতলার সভায় সভাপতিত্ব করিলেন কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়,

মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, নসীপুরের রাজা রণজিৎ সিং, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের মহারাজ-কুমার, নলিনবিহারী সরকার, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূকৈলাসের রাজকুমার সত্যধন ঘোষাল, শ্রীরামপুরের নন্দলাল গোস্বামী, ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, জানকীনাথ ঘোষাল, টাঙ্গাইলের জমিদার আবুল হালিম গজনভী, চারুচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, লাকুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায়, ফরিদপুরের উকিল অম্বিকাচরণ মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই দিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

টাউন হলের নীচের তলায় অনুষ্ঠিত সভায় নেতৃত্ব করিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, প্রভাসচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি এখানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিলাতী পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

বাংলাদেশ যাহাতে মিলনের ডোরে বাঁধা থাকে, সেই জন্য রাখীবন্ধনের প্রস্তাব হয়। এই দিনটি একটি জাতীয় শোক-দিবসের মতন আবির্ভূত হইলেও, পরাধীন জাতির পঙ্গু দেহের শিথিল ধমনীতে সেই মুহূর্তে যেন এক অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল! স্বদেশী আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত

হয়। স্থির হইল, কুটীর-শিল্প ও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নকল্পে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন নেতাদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই সময় সর্বপ্রথম চরকায় সূতা কাটা প্রবর্তন করেন। জাতীয় আন্দোলনে চরকার প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধী নহেন, মতিলাল ঘোষ।

॥ তেরো ॥

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় লাঠি খেলা ও ব্যায়াম-চর্চার আখড়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল। জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল তরুণ সমাজ। বাংলাদেশের নগরে-পল্লীতে নূতন প্রাণের বন্যা আসিল। পূর্ববঙ্গে বৃটিশ শাসক ইহা সহ্য করিতে পারিল না। ইস্তাহার জারি করিয়া প্রকাশ্য সভাসমিতি বন্ধ করা হইল। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনাকালে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ হইল।

রাজসাহী শহরে এই ইস্তাহারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভা করিলেন সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক নেতা ব্যারিষ্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল না। সিরাজগঞ্জে ইস্তাহার অমান্য করিলেন সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র

ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। এখানেও পুলিশ তাঁহাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই।

বরিশাল সম্মেলনে কিন্তু পুলিশ রুদ্র ও বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এখানে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের উপর লাঠি চালাইল এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিল। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযোগ, তিনি বিনানুমতিতে শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছেন এবং নিষিদ্ধ শব্দ 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপর এক অভিযোগ আনীত হইল, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের মানহানি করিয়াছেন।

প্রথম অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আনয়নের সময় বিহারীলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখও সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসেন। তাঁহাদের আসনগ্রহণের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথও আসন গ্রহণ করিতে যান। ইহাতে ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি করেন। সুরেন্দ্রনাথ বিচারাধীন 'বন্দী', অতএব ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ভদ্র ব্যবহারের আশা করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন সাহেব এই প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং দুইটি মামলায় দুইশত টাকা করিয়া মোট চারিশত টাকা

জরিমানা করেন। সুরেন্দ্রনাথ জরিমানার টাকা দিয়া সম্মেলন-মণ্ডপে ফিরিয়া যান।

সম্মেলনের উদ্যোগ-পর্বে এবং নেতৃবৃন্দের অভ্যর্থনা-কালে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ থাকিলেও, স্বেচ্ছাসেবকদের উপর পুলিশের লাঠি বর্ষিত হইলে সেই নিষেধাজ্ঞা পদদলিত করা হয়। পুলিশ তখন মারমুখী হইয়া উঠে। কিন্তু সন্ধ্যায় সভা ভঙ্গ হইলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি যখন আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া দেয়, পুলিশ তখন নিষ্ক্রিয় থাকে।

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক জাগরণ আনে, বরিশাল সম্মেলনে পুলিশের অত্যাচার সেই জাগরণকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়। এখানে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অত্যাচার, নেতৃবৃন্দের উপর লাঞ্ছনা এবং নিরস্ত্র জনতার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বাংলার যুব-মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্বাধীনতাকামী তরুণ সমাজ মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন যে, বিবিধ আয়ুধে সজ্জিত এই অত্যাচারী শাসক-গোষ্ঠীর নিকট দেশবাসীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ একান্ত অসহায়। প্রাচীন নেতাদের এই নীতিতে তরুণেরা আস্থা হারাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াইলেন।

বরিশাল-সম্মেলনের কিছুকাল পরে এক সন্ধ্যায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার বারাকপুরের বাড়ীতে দুই জন

যুবক একান্তে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। যুবক দুইটির মধ্যে একজন সুরেন্দ্রনাথকে বলেন, "আমরা একটি সাংঘাতিক ব্যাপারে আপনার পরামর্শ লইতে আসিয়াছি। স্যার বামফিল্‌ড ফুলারকে আমরা হত্যা করিব স্থির করিয়াছি। আজই আমরা এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহি। আপনার মতামত কি বলুন।"

সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ অবস্থার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং যুবকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ? তিনি কি করিয়াছেন?" উত্তরে এক জন বলিলেন, "বানরীপাড়ায় ফুলারের গুর্খা সৈন্যেরা মেয়েদের মর্যাদা হানি করিতেছে; আমরা ইহার প্রতিশোধ চাই।" সুরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কাজ করিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না এবং তাহাদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা দমিবার নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মেয়েদের মর্যাদার জন্য তাঁহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন।

বরিশাল সম্মেলনের পরে বরিশাল জেলার বানরী-পাড়া গ্রামে এই গুর্খা সৈন্যদল মোতায়েন করা হয়। উদ্দেশ্য, যুবকদিগকে দমন করা ও গ্রামবাসীদিগকে লাঞ্ছিত করা। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, এই যুবকেরা কোথাও

ন্যায় বিচার পাইবে না, এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াই আজ প্রতিকারের এমন ভয়ানক পথ বাছিয়া লইয়াছে, যদিও ইহা দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি তাহাদিগকে কেমন করিয়া এই কাজ হইতে নিরস্ত করিবেন, সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার স্মরণ হইল যে, ফুলার পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া একটি গুজব প্রচারিত হইয়াছে।

তিনি যুবকদ্বয়কে বলিলেন, "স্যার বামফিল্ড ফুলার পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা জান ? মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া কি লাভ ? উপরন্তু, তোমাদের এইরূপ প্রয়াস দ্বারা জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারে। তোমরা অকৃতকার্য হইলে তিনি পদত্যাগ করিতে নাও পারেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে কি ?"

সুরেন্দ্রনাথের এই কথা শুনিয়া যুবকদ্বয় তাহাদের পরিকল্পিত কার্য হইতে বিরত থাকিবে, এইরূপ সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমরা আমার পাদস্পর্শ করিয়া বল, এই কাজ করিবে না।" যুবকেরা তাহাই করিলেন।

এই ঘটনা হইতে সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে। ইহার কিছুদিন পরে মেদিনীপুর জেলা-সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করিয়া দেখেন যে, একদল যুবক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দানের

সময় তাঁহাকে পুনঃপুনঃ বাধা দিতেছে। তিনি এখানে প্রতিকূল আবহাওয়ার আঁচ পাইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, দেশের তরুণ সম্প্রদায় বৈধ পন্থায় আর আস্থাশীল নহে।

নিয়মতান্ত্রিক পন্থার প্রতি তরুণ সমাজের অনাস্থা বিশেষরূপে প্রকট হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরাট কংগ্রেসে। সুরেন্দ্রনাথ সুরাট অধিবেশনে সভাপতি-পদের জন্য স্যার রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করিলে সভাস্থল হইতে বিরোধিতা করা হয়। কংগ্রেসের কোনও অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ আর কখনও এইভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই। আপত্তিকারীরা বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করার প্রস্তাব করেন।

ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রাচীন ও নবীন মতবাদে সংঘর্ষ দেখা দিল। কংগ্রেস, জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ভারতের বত্রিশ কোটি নর-নারীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে বলিয়া দাবী করিতেছিল এবং বৃটিশ-রাজের অনিচ্ছুক হাত হইতে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য কেবলই রাজ-দরবারে আবেদন-নিবেদন জানাইয়া আসিতেছিল। তরুণ দেশপ্রেমিকেরা স্বভাবতঃই আপোষ এবং আবেদন-নিবেদনের বিরোধী। দাম্ভিক এবং ক্ষমতায় উন্মত্ত শাসকদের নিকট বারবার করজোড়ে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভিক্ষা প্রার্থনা করা

তরুণদের নিকট অসহ্য বোধ হইতেছিল। এই সময়ে বাল-গঙ্গাধর তিলক তাঁহাদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

সভাপতি লইয়া এই মত-বিরোধ উগ্র হওয়ার ফলে সইবার সুরাট কংগ্রেস বন্ধ থাকে।

॥ চৌদ্দ ॥

যেখানে আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ রোধ করা সম্ভব, সুরেন্দ্রনাথ সেখানে আপোষের পথ অবলম্বন করিতেন। এখানেই চরমপন্থীদের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। হোমরুল লীগ আন্দোলনের প্রবর্তিকা শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের প্রতি অন্তরীণের আদেশ হইলে সারা দেশে তুমুল অন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই সময় সারা দেশ এই অন্তরীণাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়। স্থির হয়, কলিকাতার শেরিফের নেতৃত্বে টাউন হলে এক সভা হইবে। কিন্তু সরকার এই সভার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

সরকারপক্ষ হইতে নিষেধাজ্ঞার সমর্থনে যুক্তি দেখান হয় যে, অ্যানি বেশান্তের উপর অন্তরীণাদেশ বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের ব্যাপার। ভিন্ন প্রদেশে সরকারের ব্যাপার লইয়া এই প্রদেশবাসীদের হৈ-চৈ করার কিছু থাকিতে পারে না। দেশবাসী এই হাস্যকর যুক্তি মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

অপর দিকে, সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করিয়া সভা করারও বিপদ ছিল। সারা দেশে উত্তেজনা বর্তমান ছিল।

পরিশেষে নেতাদের বৈঠকে অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, এই ব্যাপারে ছয় জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। এই ছয় জনের নাম: সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ ও ফজলুল হক।

ছয় জন লইয়া গঠিত এই কমিটির বৈঠকে স্থির হইল যে, লাট সাহেবকে তাঁহারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। এই অনুরোধ নিষ্ফল হইলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-পন্থা অবলম্বন করা হইবে এবং আদেশ অমান্য করিয়া প্রতিবাদ-সভা করা হইবে।

অবশেষে সেই সময়ের ছোট লাট লর্ড রোণাল্ডসে নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। সভার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল। টাউন হলে বিশাল জনসভায় অ্যানি বেশান্তের প্রতি অন্তরীণাদেশের প্রতিবাদ করা হইল।

১৯০৮ সাল। বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় ইতোমধ্যে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে আস্থা হারাইয়া যে সন্ত্রাস-বাদের পথ ধরিয়াছে, এই বৎসর ৩১শে মার্চ তাহার প্রথম আভাস পাওয়া গেল। ৩১শে মার্চ রাত্রে মজঃফরপুরের

জেলা-জজ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা-বিস্ফোরণ হয়। কিন্তু, লক্ষ্যে ভুল ছিল বলিয়া সেই বিস্ফোরণে কিংস্‌ফোর্ড মারা যান নাই; মারা গেলেন মজঃফরপুরের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রিঙ্গল কেনিডীর স্ত্রী ও তাঁহার ষোড়শী কন্যা। প্রিঙ্গল জাতিতে ইংরেজ হইলেও, এই দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল।

কিংস্‌ফোর্ড কলিকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট্ থাকাকালে স্বদেশী মামলার বিচারে বহু যুবককে নির্মমভাবে দণ্ডিত করেন। যুবক-সমাজ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠে। তাঁহাকে হত্যার ভার দেওয়া হয় ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির উপর। মজঃফরপুরের বোমা-বিস্ফোরণের জন্য ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং চাকি আত্মহত্যা করেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই কলিকাতায় মুরারিপুকুর-ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। স্থানে স্থানে সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের আত্মপ্রকাশ দেখিয়া বৃটিশ আমলাতন্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠে। দমন-নীতির মাধ্যমে তাহারা যুবকদিগকে সায়েস্তা করিবে স্থির করে। দমন-নীতির বেড়াজালে শুধু তরুণ-দিগকেই নহে, স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের বহু প্রধান নেতাকে ১৯০৮ সালে আটক করা হয়। এই নেতাদের মধ্যে ছিলেন, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত,

কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্র-প্রসাদ বসু, সুবোধ মল্লিক। ১৮১৮ সালে প্রবর্তিত রেগুলেশান থ্রি বা তিন আইনে তাঁহাদিগকে আটক করা হয়।

॥ পনেরো ॥

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে সুরেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ হইতে সাংবাদিকেরা যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৫ই মে বিলাত যাত্রা করেন এবং ৩রা জুন সেখানে পৌঁছেন।

৮ই জুন সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে লর্ড ক্রোমার ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ-প্রসঙ্গে বলেন যে, কোনও কোনও ভারতীয় সংবাদপত্র উহাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য দ্বারা ভারতে বিপ্লববাদের বিস্তৃতিকে সাহায্য করিতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ উক্ত সম্মেলনে ছিলেন ভারতের পক্ষ হইতে একমাত্র প্রতিনিধি। ক্রোমারের এইরূপ মন্তব্য শুনিয়া তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বাংলাদেশে সম্প্রতি যে বিদ্রোহভাব দানা বাধিতেছে, তাহার জন্য কতকগুলি সংবাদপত্র দায়ী বলিয়া লর্ড ক্রোমার যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটি সংবাদ-

পত্রে দায়িত্বশূন্য মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলিতে চাই যে, এইরূপ সংবাদপত্রের সংখ্যা খুব কম এবং জনচিত্তে তাহাদের প্রভাবও সামান্য।" সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে সুরেন্দ্রনাথ 'সংবাদপত্র ও সাহিত্যসেবা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের কাজ শেষ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিন লণ্ডনের বাহিরে সফর করেন। প্রথমে তিনি ও অন্যান্য সাংবাদিক কভেন্ট্রি যান। সেখান হইতে ওয়ারউইক প্রাসাদ পরিদর্শনে যান এবং অতঃপর অক্সফোর্ড রওনা হন। অক্সফোর্ডের পথে তাঁহারা ষ্ট্রাটফোর্ড অন্ এভেন্ নামক পল্লীতে সেক্সপীয়রের জন্মস্থান পরিদর্শন করেন।

অক্সফোর্ডের নিউকলেজে ধূমপান-প্রকোষ্ঠ ও মদ্যভাণ্ডার দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মন পীড়িত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ছাত্রজীবনে পবিত্রতা, সংযম, ভক্তি ও ভোগে অনাসক্তিই প্রাচীন ভারতের আদর্শ। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও কদাপি ধূমপান করেন নাই, মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার পরিবার ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত। এই পরিবারের যাবতীয় ঐতিহ্যই তাঁহার জীবন-মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। শুধু গোঁড়ামির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সনাতনপন্থীদের গোঁড়ামি বর্জন করিয়া এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংকীর্ণতা নূতন যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিশ্লেষণ ও পরিহার করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই

ছিল তাঁহার নীতি। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমোদিত বিধবা-বিবাহেরও তিনি সমর্থক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের অনেক ইংরেজ বন্ধু ছিল। মিঃ টার্নবুল তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। টার্নবুল সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে ধূমপানে আসক্ত করিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার অনেক চেষ্টাই বিফল হয়। শেষে তিনি প্যারী প্রদর্শনী হইতে সুরেন্দ্রনাথকে একটি সুদৃশ্য সিগারেট-দানি কিনিয়া উপহার দেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্ধুকে অসন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। বন্ধুর উপহার গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকদিন ধূমপানও করিলেন। কিন্তু, ইহা অধিক দিন তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি ধূমপান ত্যাগ করিলেন।

অক্সফোর্ড হইতে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার গমন করেন। এখানে এক ভোজ-সভায় তিনি যে বক্তৃতা দেন, শ্রোতৃমণ্ডলী তাহাতে যারপর-নাই মুগ্ধ হন। ম্যাঞ্চেষ্টার শহরের বিভিন্ন সংবাদপত্র পরদিন তাঁহার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্যালেস হোটেলে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ এবং বিনা বিচারে আটক আইনের বিরুদ্ধে আবেগময়ী ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। দমন-নীতির কঠোর সমালোচনা-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "বিফলতার এমন উদাহরণ আর কোথাও দেখা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে দমননীতি কবে সফল হইয়াছে?"

সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক দেশপ্রেমিক। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কোন প্রকার নির্যাতন বা পীড়নের ভয় তাঁহাকে উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। বিলাতে মিঃ ষ্টেড্ কর্তৃক আহূত এক সভায় সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আপনি যদি ঘাতকের নিকটে নীত হন এবং সেই সময় যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইংরেজ জাতির নিকট আপনার স্বদেশ সম্বন্ধে শেষ বাণী কি আছে, তখন আপনি কি বলিবেন ?"

এক মিনিট ইতস্ততঃ না করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি প্রথমে বলিব, বঙ্গভঙ্গ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করুন। তার পরে বলিব, দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিন এবং বাংলাদেশে হেবিয়াস কর্পাস বাতিল করিয়া দিয়া যে আইন প্রণীত হইয়াছে, উহা প্রত্যাহার করুন।"

সুরেন্দ্রনাথ এই সভায় আরও বলেন, "আমি চাই সমগ্র বাংলাদেশ একজন শাসনকর্তার অধীনে থাকুক। লর্ড কার্জন তাঁহার তরবারি দ্বারা বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়াছেন। যতক্ষণ ইহা বলবৎ থাকিবে, ততক্ষণ দেশে অশান্তি ও বিক্ষোভ চলিতে থাকিবে।

বঙ্গভঙ্গ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দুই বৎসর পূর্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ এই উক্তি করেন। দুই বৎসর পরে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়।

॥ ষোল ॥

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহার ফলে জাতীয় কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। এক দলের নাম নরমপন্থী এবং অপর দলের নাম চরমপন্থী। মণ্টেগু-রিপোর্টের বিরুদ্ধে চরমপন্থী দল অসন্তোষ প্রকাশ করে কিন্তু নরমপন্থীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে উহাকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়। সুরেন্দ্রনাথ নরমপন্থীদের অন্যতম ছিলেন। অপর দিকে বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা।

কংগ্রেসের মধ্যে এই দুই দলের সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় মীমাংসার অনেক চেষ্টা হয়; কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ।

সুরেন্দ্রনাথের মতে, এই সময় তাঁহাদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল। এক, সংগ্রামের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির পথ; দুই, বিপ্লবের বিপদাকীর্ণ পথ। সুরেন্দ্রনাথ বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই, তিনি মণ্টেগু-রিপোর্ট অনুযায়ী শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মতে, ইহা দ্বারা তিনি মূলনীতির কিছু মাত্র পরিবর্তন করেন নাই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে মূলনীতির সামঞ্জস্য রক্ষা

করিয়া চলিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন মাত্র। পরে অবশ্য বালগঙ্গাধর তিলকও কতকটা নরম পন্থার সমর্থক হন।

সুরেন্দ্রনাথ মণ্টেগু-রিফর্মের অন্তর্ভুক্ত ফ্র্যানচাইজ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট বাহির হইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থীরা বিলাতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। বিলাতে লর্ড সিডেনহামের নেতৃত্বে কিছু লোক এই সময়ে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিরোধিতা করিতেছিলেন। ইঁহাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যেই সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থীরা বিলাতে প্রতিনিধিদল প্রেরণে উদ্যোগী হন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি দশ-বারো জন প্রতিনিধি এই দলে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ইহার নেতৃত্ব করেন।

শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত এবং বালগঙ্গাধর তিলকও এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ভারতে সংস্কারমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন-সম্পর্কে এই সময়ে বিলাতে জয়েণ্ট কমিটির অধিবেশন হয় এবং এই কমিটির বহু নেতৃস্থানীয় ভারতীয়ের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়। চরমপন্থী (কংগ্রেস) এবং নরম-পন্থী (সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ) উভয় পক্ষই কমিটির নিকট সাক্ষ্য দেয়। ভারতে ক্রমে ক্রমে শাসন-সংস্কার হউক এবং এইভাবে কানাডার ন্যায় স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রবর্তিত হউক, ইহাই সুরেন্দ্রনাথেরও অভীপ্সিত

ছিল। ভারতের নরমপন্থীদের ইহাই ছিল রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা।

জয়েণ্ট কমিটি যে সময় ভারতীয় নেতাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে মাইকেল ও'ডায়ার পাঞ্জাবে নিষ্ঠুর পীড়ন আরম্ভ করেন। এই সময়েই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, ডাঃ কিচলু ও সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচারে সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এমন কি, কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে নরমপন্থীরাও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কণ্ঠ মিলাইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ লণ্ডনে অবস্থানকালে মণ্টেগু সাহেবের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতীয়দের প্রতি আচরণ ও তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি মণ্টেগু সাহেবের সঙ্গে আলাপ করেন।

॥ সতেরো ॥

চারিমাস বিলাতে থাকার পরে সুরেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ইতোমধ্যে দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বৃটিশের শাসন-সংস্কারের অন্তঃসারহীনতা

সম্পর্কে দেশব্যাপী প্রবল প্রচার-কার্য চালাইয়াছেন। বাংলাদেশেও তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুরেন্দ্রনাথ সংস্কারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই, এইবার বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে দেখা গেল, তাঁহার অভ্যর্থনায় ভাটা ধরিয়াছে।

নূতন ব্যবস্থানুযায়ী নির্বাচন আরম্ভ হইলে প্রথমে অসহযোগী নেতৃবৃন্দ নির্বাচন বয়কট করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বারাকপুর মহকুমার পৌরসভাগুলি হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচিত হইলেন। তখন লর্ড রোনাল্ডসে বাংলার ছোটলাট। সুরেন্দ্রনাথ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন নবাব আলি চৌধুরী।

সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসী অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ বিবেক ও বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া বৃটিশ লাটের অধীন মন্ত্রীর পদে বৃত হইলেন এবং বাংলাদেশের পৌরসভা ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ কল্যাণ সাধনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি সর্বাগ্রে তৎপর হইলেন কলিকাতা পৌরসভা-আইন সংশোধনের জন্য। নগরীর পৌরশাসন-ব্যবস্থাকে এবং সমস্ত বাংলার পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন শাসন-সংস্কার দ্বারা উন্নত ও গণতান্ত্রিক করিয়া তুলিতে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় নূতন পৌরসভা-আইন

বিধিবদ্ধ হইল এবং কলিকাতা কর্পোরেশনে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের মন্ত্রীর পদে বহাল থাকিয়া জন-প্রতিনিধিদের পরামর্শ মতে কাজ করিতে সতত যত্নশীল ছিলেন।

মন্ত্রী হইয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-শহরে তিনি এই উদ্দেশ্যে সফর করেন। কিন্তু তখন অসহযোগীদের প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় অনেক শহরেই তিনি অনাদৃত হন।

প্লাবন, ম্যালেরিয়া-নিবারণ, বাংলাদেশে জল নিকাশের উন্নত প্রণালীর ব্যবস্থা-প্রবর্তন তাঁহার কার্য-তালিকাভুক্ত ছিল। সেই যুগে বাংলাদেশ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায়ই সরকার হইতে ম্যালেরিয়া-দমন সমবায়-সমিতি ও কালাজ্বর-সমিতি নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হয়।

পৌর সভায় জন-সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পরে তিনি লোকাল বোর্ডগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় জন-সাধারণের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

এতকাল কলিকাতা নগরীর করদাতারা শুধু করই দিয়া যাইতেন; পৌর শাসন-ব্যবস্থায় তাঁহাদের কোন হাত ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন নূতন করিয়া রচিত ও গৃহীত হইল। ইহার ফলে, নাগরিকদের প্রদত্ত কর তাঁহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বে পৌর-কল্যাণে ব্যয় সম্ভব হইল।

বলিতে কি, এই আইন সুরেন্দ্রনাথের এক অপূর্ব কীর্তি! ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ইহা বিধিবদ্ধ হয়। ইহা বিধিবদ্ধ করিতে পারিয়া তিনি নিজেও প্রচুর আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রিপদে থাকিয়া তাঁহার বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হইলেন। এই কাজে তাঁহাকে অনেক বিঘ্নের মুখে পড়িতে হয়। প্রথমেই তিনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান-পদে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়কে নিয়োগ করেন। শুধু স্বায়ত্তশাসন-বিভাগেই নয়, চিকিৎসা-বিভাগেও তিনি এই নীতিই অনুসরণ করেন। কারণ, তিনি একই সঙ্গে উভয় বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তবে, সুরেন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে প্রার্থীর যোগ্যতা বিচারে কখনও কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই।

সেই যুগে বাংলাদেশে মেডিক্যাল স্কুলের একান্ত অভাব ছিল। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারই আমলে ময়মনসিংহে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং চট্টগ্রাম, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে।

সুরেন্দ্রনাথ সংস্কারপন্থী ছিলেন বলিয়া চরমপন্থীদের

ন্যায় তাঁহাদের সমর্থক সংবাদপত্রগুলিও সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে সতত কলকণ্ঠ ছিল।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর এক ভয়াবহ বন্যা হয়। বন্যার সেবা-কার্যের দায়িত্ব মন্ত্রী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের কিছুই ছিল না। তথাপি বন্যা-প্রপীড়িতদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি তখন দার্জিলিংএ ছিলেন। সেখান হইতে বন্যা-পীড়িত স্থানে পৌঁছিতে তাঁহাকে প্রখর রৌদ্রে বিশ মাইল পথ ট্রলি-গাড়ী যোগে অতিক্রম করিতে হয়। পরের দিন তিনি দার্জিলিং ফিরিয়া যান। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর এই পথ-শ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি জ্বরে পড়িলেন এবং ফুসফুসের প্রদাহ আরম্ভ হইল। ইহার পরও কতকগুলি সংবাদপত্র সুরেন্দ্রনাথের নিন্দা করিয়াছিল।

॥ আঠারো ॥

১৯২৫ সালের ৭ই আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তাঁহার দীর্ঘজীবন লাভের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা

যায় যে, তিনি সর্বদা পরিমিতভোজী ছিলেন। এমন কি, এই কারণে তিনি নিমন্ত্রণ খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীর লোকেরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে আদর করিয়া অনেক সময় বেশী খাওয়ান কিংবা বেশী খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

স্বাস্থ্যের জন্য সুরেন্দ্রনাথের সাধনা ছিল অপরিসীম। বার্ধক্যক্লিষ্ট হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সকাল বৈকাল কমপক্ষে আধ ঘণ্টা ব্যায়াম-চর্চা করিতেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে আহার ও নিদ্রা যাইতেন। কদাপি তিনি বেশী রাত্রে আহার করিতেন না। অধিক রাত্রি না করিয়া শয্যা গ্রহণ ও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ তাঁহার নিত্য দিনের অভ্যাস ছিল। তিনি আট ঘণ্টা ঘুমাইতেন। কখনও কখনও দশ ঘণ্টা গাঢ় নিদ্রাভোগ করিতেন। নিরুপদ্রব নিদ্রাভোগ সম্ভব হইলে, মস্তিষ্কের অত্যধিক শ্রমও স্বাস্থ্যহানির কারণ হয় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

জীবনে কখনও তিনি মদ্যপান বা ধূমপানে অভ্যস্ত হন নাই। শরীর সুস্থ ও কর্মঠ রাখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের প্রফুল্লভাব বজায় রাখা ও ঘৃণা, হিংসা পরিত্যাগ করা। এই সবই সুরেন্দ্রনাথের শেষ জীবন অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে নম্রভাব সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ জীবনে কখনও পরের বুদ্ধিতে চালিত হন

নাই। তিনি নিজের বিবেক অনুযায়ী চলাই অধিক পছন্দ করিতেন। এমন কি, একবার তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইতেন, কখনও তাহা লঙ্ঘন করিতেন না। তাঁহার বিবাহ-ব্যাপারেই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

মণিরামপুরের বাড়ীতে একবার সাড়ম্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা হইতেছিল। পূজা-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। সুরেন্দ্রনাথও তথায় ছিলেন। স্থানীয় জনৈক অধিবাসী সুরেন্দ্রনাথকে ঠাট্টা করিয়া একটি পরমা সুন্দরী বারো বৎসরের কন্যা দেখাইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে তিনি সম্মত কিনা প্রশ্ন করেন। কন্যাটির পিতা নাই, বিধবা মা একমাত্র অভিভাবিকা, ইহাও সুরেন্দ্রনাথকে বলা হয়।

সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিন্তু সুরেন্দ্র-নাথের পিতা এক ধনিকন্যার সহিত বিবাহ-প্রস্তাব আনেন। ভাবী ধনী শ্বশুর বিলাতে তাঁহার পড়ার খরচ চালাইতে রাজী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাবার নিকট প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ করিলে দরিদ্র কন্যা চণ্ডীদাসী দেবীর সহিতই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহে পণ নিবেন না, সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করেন।

॥ উনিশ ॥

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ সুরেন্দ্রনাথ ভারতের পক্ষে আন্দোলন করিবার জন্য তৃতীয়বার লণ্ডন যাত্রা করেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে আগষ্ট মাসে "বামা-বোধিনী পত্রিকায়" "সুরেন্দ্রবাবুর প্রত্যাগমন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হয়, "কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতের নানাস্থানে ভারত সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একজন উচ্চদরের বাগ্মী বলিয়া ইংরাজ-সমাজেও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।"

২১শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনার জন্য কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

ইহা ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথের সমকালে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও তেজস্বিতার জন্য সেইকালে অনেকে তাঁহাকে নাম দিয়াছিলেন, 'সারেণ্ডার নট্'।

১৩১৩ সালের ১৫ই বৈশাখ তারিখে কলিকাতা বাগ-বাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু বাহাদুরের গৃহে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"এই সভাস্থলে দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম

লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমাল্য পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্র মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন, যাঁহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান, আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মত বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আজ আহ্বান করিতেছি।”

* * * *

“প্রবাহ” নামক মাসিক পত্রিকায় (১৩১২ সালের কার্তিক সংখ্যায়) উহার সম্পাদক দামোদর মুখোপাধ্যায় এম. এ. বিদ্যানন্দ মহাশয় লেখেন ঃ

“নেতৃদলের মধ্যে এক দেবোপম কীর্তিকৌমুদী-সমাবৃত প্রসন্নানন মহাত্মা অত্যুচ্চ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বঙ্গবাসী জনগণকে কর্তব্যপথ দেখাইয়া দিতেছেন; সেই মহাত্মা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তাঁহার প্রেরণায়, তাঁহার আদেশে, তাঁহার সঙ্কেতে একটা সমগ্র জাতি পরিচালিত হইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে;

আজ একটা জাতি আপনাদের বিত্তা ও বুদ্ধি, ধন ও সম্পদ, মান ও মর্যাদা, তাঁহারই বাসনার অধীন করিয়া দিয়াছে। ধন্য দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! আপনি আমাদিগের পূজার পাত্র হইয়াছেন। আপনি আমাদিগের শরণ্য ও অবলম্বনীয় হইয়াছেন। আপনি আমাদিগের জ্ঞান ও গতির নিয়ামক হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সুরেন্দ্রনাথ! আজ গৌরবালঙ্কারে তোমার দেহ বিভূষিত এবং আজ তুমি দেবতার ন্যায় সমাদৃত।

বড়ই সুখের বিষয়, পাঁচমাস পূর্বে আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা উপেক্ষা কর নাই। মহত্ত্বের ইহাই লক্ষণ। ক্ষুদ্রের হিতকথা মহৎ ব্যক্তি শুনিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমরা যাহা-যাহা বলিয়াছিলাম, দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! তুমি তাহার সকলই করিয়াছ। তোমার দৈবশক্তিসম্পন্ন রসনা হইতে মধুক্ষরা মাতৃভাষার অমৃতময়ী পদলহরী স্যন্দিতা হইতেছে; তুমি এতদিন পরে সেই স্বজাতীয়গণের চির-সমাদৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সর্ব-সমক্ষে বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইতেছ। তোমাকে বাঙ্গালীর আদরের ধুতি-চাদরাবৃত দেখিয়া, তোমার মুখে সেই আজন্মপরিচিত বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিয়া আমাদিগের নয়নে জল আসিয়াছিল। তুমি কৃতী, তুমি ক্ষমতাশালী, তুমি দেবানুগৃহীত; তোমাকে রূপান্তরিত দেখিলে বা তোমাকে

বৈদেশিক ভাবাপন্ন বুঝিলে ভক্তের হৃদয় অভিমানে ফাটিয়া যাইত। সে অভিমান দূর হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ! এখনও আমাদিগের মনে পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় নাই, এখনও দেবতা সুরেন্দ্রনাথ, তোমার দেবত্ব সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা এখনও তোমাকে স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারানুগত মহাপুরুষ রূপে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি। সুরেন্দ্রনাথ! আমাদিগের এ বাসনা কি মিটিবে না? আমাদিগের সনাতন দেব-দেবীর মন্দির-সমীপে তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণত হইতে আমরা কি দেখিব না? তোমার মুখ হইতে আমাদিগের আর্যধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন কি শুনিব না? আর্যের প্রতিষ্ঠিত অতুলনীয় আচার-ব্যবহারের আনুগত্য তুমি কি করিবে না? সুরেন্দ্রনাথ! দেশের এই বিনীত প্রার্থনা তুমি কি শুনিবে না?

কার্যময়, সময়জ্ঞ, সুশীল সুরেন্দ্রনাথ! আমাদিগের প্রার্থনা কঠোর নহে, আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা দুষ্কর নহে, আমাদিগের বাসনা নিন্দনীয় নহে; তবে হে মহাত্মন্! কেন তুমি সপ্তকোটি মানবের এইরূপ হৃদয়ভাবের পোষকতা করিয়া, তাহাদিগের হৃদয়-মন্দিরে আপনার স্বর্ণ-সিংহাসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার মনে কর্তব্যের সলিল-ধারা সংযোগ করিয়া, তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে না? তুমি অনেক করিয়াছ, হে দেবতা! তুমি কার্য-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছ, তোমার মুখ হইতে স্বদেশীয় ভাষা

স্রোতস্বিনীর জলধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তুমি স্বজাতীয়গণের ন্যায় বেশ-ভূষা গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছ। নিশ্চয়ই সুরেন্দ্রনাথ, তুমি সনাতন স্বধর্মানুগত হইয়া আমাদিগের অচ্ছেদ্য প্রেম, ভক্তি ও আসক্তি উপভোগ করিবে।

তুমি হিন্দু সন্তান, হিন্দুনামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াই তুমি গৌরবান্বিত হইয়া থাক। কিন্তু যে হিন্দুধর্মের তুমি সেবক, তাহা রঞ্জিত, তাহা বিকৃত এবং তাহা স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত; কয়েক ব্যক্তি সময় ও সুবিধানুসারে তাহা গঠন করিয়াছেন মাত্র। দেবতা সুরেন্দ্রনাথ! তুমি সেই পরিপুষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া চিরসেবিত স্বধর্মানুশীলনে তৎপর হও, সেই রঞ্জিত বিকৃত ধর্মসেবা পরিহার করিয়া স্বদেশীয়গণের চির-সমাদৃত ধর্মপথের অনুগামী হও। আর তোমাকে কি বলিব, তোমার মহত্ত্বে বাঙ্গালী মহৎ হইয়াছে, তোমার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গবাসী তেজস্বী হইয়াছে, তোমার প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া বাঙ্গালী তোমার নিকট আত্মনিবেদন করিয়াছে। তুমি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, তুমি তেজস্বী ও উদ্যমশীল, তুমি না করিতে পার কি?"

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ উত্তর ভারত সফর করিয়া দেশের আপামর জনসাধারণকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে

রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলী সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সমগ্র ভারত একাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইল। এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকমল ভট্টাচার্যকে বলিয়াছিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমার পাকা চুল আবার কাঁচা হইয়া উঠিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথের কারাবরণের খবর পাইয়া ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় "সুরেন্দ্র-বিজয়" নামক একটি পদ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ :

"কি দুঃখের দিন আজি ভারতে উদয়,
হাহাকার রব শুধু শুনি দেশময়।
নরনারী বালবৃদ্ধ ভারতের লোক,
সুরেন্দ্রের কারাবাসে করিতেছে শোক।
মাদ্রাজী, পারসী, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান,
রাজপুত, শিখ, জৈন, উড়িয়া, খৃষ্টান।
সমবেত স্বরে সবে করিয়ে রোদন,
মুক্ত মুখে ব্যক্ত করে মনের বেদন।
সুরেন্দ্রের কারাবাস! অসম্ভব কথা!
কি বিষম! কি বিষম! একি মর্মব্যথা!
রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধে সুরেন্দ্র মতন,
ভারত ভিতরে লোক আছে কয় জন?

সকল তেজিয়া যিনি স্বদেশের হিতে,
ধন মন সমর্পণ কৈলা এক চিতে।
প্রবলের অত্যাচারে দুর্বলে রাখিতে,
কাহার তুলনা হয় সুরেন্দ্রের সহিতে ?
কাহার বক্তৃতা শুনি মানসে উল্লাস ?
কাহার লেখনী দেয় হেন উচ্চ আশ ?
কার অধ্যাপনা গুণে যত ছাত্রগণ,
গুণ পক্ষপাতী তাঁর হয়েছে এমন ?
স্বদেশের কল্যাণ সাধক হেন নর,
কোথায় দোসর তাঁর, কে আছে দোসর ?
এহেন সুরেন্দ্রনাথ ধীর তেজি রাজপাটে,
কারাগারে বদ্ধ আজি শুনি বুক ফাটে !
ভারতের হিতকারী ফসেট সুজন,
আমাদের ভাগ্যদোষে অন্ধ দু'নয়ন !
তথাপি ভারত তরে চিন্তিত নিয়ত,
দূরে থাকি ভারতের অনুরাগে রত।
ব্রাইট ভারতবন্ধু, সুশীল, সরল,
বক্তৃতা অমৃত-সিন্ধু, অখল, অমল।
চক্ষে না দেখিয়া কভু ভারত কেমন
এদেশের প্রতি তবু মমতা এমন !
লর্ড নর্থব্রুক ধীর পূর্ব-প্রতিনিধি,
অনায়াসে তেজিলে রাজ্য দেখিয়া অবধি।

ফিয়ার বিচারপতি বাঙ্গালীর মিত্র,
কি মধুর, কি পবিত্র, তাঁহার চরিত্র।
বঙ্গবালা বিদ্যাশিক্ষা উন্নতি কারণ,
পতিপত্নী কত ব্যস্ত ছিলে অনুক্ষণ!
ধার্মিক ইংরাজ আরো আছে কত শত,
বর্ণভেদ না মানিয়া প্রজাহিতে রত।
সকাতরে তোমাদের করি হে স্মরণ,
কর কর বাঙ্গালীর দুঃখ বিবেচন।
কমন্স্ সভায় আর লর্ডের সমাজে,
এই সব দুঃখ-কথা জানাও অব্যাজে।
দোষের উচ্চসীমা জরিমানা হয়,
সে দোষে সুরেন্দ্র কেন কারাবাসে রয়?
কোথা মা ইংলণ্ডেশ্বরি ভিক্টোরিয়া সতি!
আসি দেখ তব প্রিয় ভারত-দুর্গতি।
আছে বহু অধিকার তোমার জগতে,
তুলনা কি কারো সনে হয় মা, ভারতে?
কোথাকার নরনারী সরল সুজন,
প্রজাকুল রাজভক্ত কোথায় এমন?
সেদিন ঘাতক হাতে তুমি পেলে ত্রাণ;
এ সংবাদে যত তব ভারত-সন্তান—
বালবৃদ্ধ নরনারী আনন্দে আকুল,
জানি না সে উল্লাসের আছে কিনা তুল!

তোমার যে কতগুণ বর্ণিব কেমনে,
চিরকাল গাঁথা আছে আমাদের মনে !
করিয়াছ উপকার অসীম অসম,
কে না জানে, না মানে বা কোন্ নরাধম ?
"দেখ মা, সুরেন্দ্র দোষী কোন্ অপরাধে,
কোন্ পাপে রাখে তাঁরে কারা-অবরোধে ?
করুণারূপিণী তুমি ভারত-ঈশ্বরি !
আমাদের পূর আশ সুবিচার করি !
"ভারতের রাজ্ঞী" নাম করেছ ধারণ,
কৃপা-দৃষ্টি কর তার রক্ষার কারণ !
"ওহে রাজ-প্রতিনিধি ধার্মিক রিপণ !
পক্ষপাতশূন্য ধন্য সরল সুজন !
যে কাজ করেছ তুমি এদেশেতে আসি,
জন্মে কি ভুলিবে কভু আর্যভূমিবাসী ?
ছিল না যা—কখনো যা—ভাবে নাই মন,
তা দিতে প্রস্তুত আছ—স্বায়ত্ত-শাসন।
যেমন ভূপতি তুমি, সচিব তেমন,
ভারতের ভাগ্যগুণে হয়েছে মিলন।
মেজর বেরিং নাম সর্বগুণধর,
ধন্য সে ইংলণ্ড ! যার হেন পুত্রবর।
যোড় করে তোমা প্রতি এই অনুরোধ,
দয়া করি মুক্ত কর সুরেন্দ্র-নিরোধ !

বিলাতে জানাও যদি হয় প্রয়োজন,
সদুপায় করি কর দুঃখ নিবারণ !
ওহে শালগ্রাম শিলা দেব নারায়ণ !
তব মান রক্ষা তরে এই দুর্ঘটন !
হায় কিবা বিচারক ! কি বুদ্ধি সরস !
তোমার আকার দেখে বুঝিবে বয়স !
বলে হ'ক ছলে হ'ক বিবাদীর মতে,
হিন্দুর আরাধ্য শিলা আনে আদালতে !
এই গুরুতর কথা করি আন্দোলন,
হায়রে পড়িল বাঁধা সুরেন্দ্র রতন।
ধন্য হে ভারতবাসী ! আর্যের সমাজ,
বড় সুখী হইয়াছি দেখি তব কাজ।
একতায় বদ্ধ সবে সুরেনের লাগি,
তার দুখে সবে যেন সমদুখভাগী।
করিতেছ মহাসভা নগরে নগরে,
দেখাতেছ শোক-চিহ্ন প্রতি ঘরে ঘরে।
কালাফিতা হাতে বাঁধি যুবকের দলে,
সুরেন্দ্র-বিয়োগ-ব্যথা জানায় সকলে।
শহরে কি পাড়াগাঁয়ে, রাজপথে, মাঠে,
প্রাসাদে, কুটীরে, তরুমূলে, হাটে ঘাটে ;
দু'জন অথবা যেথা বেশী লোক রয়,
সুরেন্দ্রের কারারোধ কথা তথা হয়।

বালক, যুবক, বৃদ্ধ, নবীন, প্রবীণ,
জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কিবা ধনী দীনহীন ;
ভদ্র বা ইতর কিম্বা হ'ক যেই জাতি,
একবাক্যে করে সবে সুরেন্দ্র-সুখ্যাতি।
ঘরে ঘরে এক কথা ; নারীর সমাজ
আলোচনা করে তাই ছাড়ি নিজ কাজ।
সুরেন্দ্রের তরে সবে করে হায় হায়,
যাঁর লাগি সবে দুখী ধন্য সে ধরায়।
ধন্য হে বিচারপতি সুধীর রমেশ !
তোমার বিচারগুণে খ্যাত বঙ্গদেশ !
সার্থক তোমারে গর্ভে ধরে বঙ্গমাতা,
বিপদ-সাগরে হ'লে বরাভয় দাতা !
চারিজন প্রতিপন্ন বিচারক মুখে
বাধা দিয়ে নিজমত জানাইলে সুখে !
এর চেয়ে সুযশ সুনাম কিবা আর ?
ভারতে রহিল কীর্তি—গুণ-পুরস্কার।
দিবাতন শশি মত বসি কারাগারে,
ভাব কি সুরেন্দ্র ধীর, ভারতমাতারে ?
যে সূত্রে গিয়েছ জেলে তুমি গুণধর,
তাহাতে জগতে তুমি হইলে অমর।
মাতা জন্মভূমি স্বর্গ চেয়ে গরীয়সী,
সার্থক করিলে বাক্য—ভারতেতে আসি।

লভিলে সমাজ মাঝে মনোমত ধন,
ধন্য ধন্য তাই তুমি! সার্থক জীবন!
স্বদেশ-মঙ্গল-পদে সঁপিয়াছ প্রাণ,
স্বার্থনামা মহিষেরে দিয়ে বলিদান।
করিয়াছ বহুশ্রম যে দেশের তরে,
রাখিলে অতুল কীর্তি তাহার ভিতরে।
রাহুমুক্ত রবি প্রায় কারামুক্ত হয়ে,
মনসুখে, হাস্যমুখে, দারাসুত ল'য়ে,
কাটাইবে শেষকাল সুপবিত্র সুখে,
নিত্য পাবে আশীর্বাদ স্বদেশীর মুখে!
স্বর্ণাক্ষরে নাম তব দীপ্তিমান রবে,
যতকাল ইতিহাস বিদ্যমান ভবে।"

—শেষ—